বিভূতিভূষণের গল্পে মুসলমান জন-জীবন ও লোকায়ত অন্বয়

আফিফ ফুয়াদ

এক

> ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ্'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ — ওরে বাবা — এ কি রে! চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভালো করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙ্গিল এবং আরও গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে — পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

উদ্ধৃত অংশটি *শ্রীকান্ত* প্রথম পর্বের। বাঙালি একটি জনগোষ্ঠী ও মুসলমান একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়; হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়-এর মতো মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষ এবং বাঙালি না হয়েও একজন মুসলমান বা হিন্দু হতে পারে — এ ভুল অধিকাংশ হিন্দু-মধ্যবিত্তের মতো শরৎচন্দ্রও করেছিলেন। বাঙালি জনগোষ্ঠীর গড়ে ওঠার নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস আছে, তার ভাষা-সংস্কৃতি-প্রকৃতি বিশেষ মাটি থেকে উৎসারিত, সেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আধুনিক অভিধায় রাজনৈতিক সম্প্রদায় সাময়িক বিষয় — মহা-সময়ের প্রেক্ষায় ক্ষণিকের জন্য সমাজে আসে ও চলে যায়, একথা শরৎচন্দ্রের মতন মহৎ লেখকের জ্ঞানকাণ্ডে, চৈতন্যে ছিল না, ভাবতে অবাক লাগে। বাংলা সাহিত্যের ইমারতটি যে কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে — তা হল এক ঠাকুর, দুই চট্টোপাধ্যায়, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুই চট্টোপাধ্যায়ের একজন। এবং শরৎচন্দ্র প্রথম লেখক যাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ভিন্নতর — প্রত্যক্ষ ও যাপিত। শরৎচন্দ্রের এই যাপন, ভবঘুরে অবলোকন এবং পঠনপাঠন আন্তর্জাতিক লেখকদের স্তরের। এবং *শ্রীকান্ত* উপন্যাসটি লেখা হিসেবে মৌলিক ও আন্তর্জাতিক। তবু তাঁর লেখায় কেন এ ধরনের অসম্পূর্ণতা?

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের একটি সাহিত্য-দলিল। সামন্ত-ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয় ও যন্ত্রসভ্যতার নাগরিক হাতছানি — দুই-ই আছে গল্পটিতে। ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে একই সঙ্গে *বসুমতী* ও *পল্লীশ্রী* পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ পাওয়ার পর সামন্ত পাণ্ডুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। '... এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরনের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।' ('মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' *শরৎ রচনাবলী* তৃতীয় খণ্ড) 'মহেশ' গল্পটি এক সময়ে Matric-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েও 'গোহত্যা' আছে বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

'মহেশ' গল্পটি গফুর, আমিনা ও একটি ষাঁড় এই নিয়ে গড়ে ওঠা ছোটো গরিব বাঙালি মুসলমান চাষি পরিবার ও তার সঙ্গে হিন্দু জমিদার, হিন্দু-প্রধান গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের সম্বন্ধ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির গল্প। গল্প হিসেবে 'মহেশ' অনবদ্ধ হওয়ার পরও বিরাট ত্রুটি আছে গল্পটিতে: মুসলমানরা ষাঁড় পোষে না। চাষের জন্য বলদ ও দুধের জন্য গাই-গোরু গ্রামবাংলার যেকোনো মুসলমান পরিবারে পাওয়া গেলেও 'ধর্ম্মের ষাঁড়' পাওয়া যাবে না। শরৎচন্দ্রের মুসলমান জনজীবন অবলোকন গভীর মমতায় ও মরমি চোখে না হলে গফুর, আমিনা চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্তটাই দূর থেকে। 'জীবনে জীবন যোগ' না করলে অন্দরমহল — হেঁসেল, গোয়ালের খোঁজ পাওয়া যায় না। এই কাজটি বিভূতিভূষণ অনেকাংশে করেছিলেন। তাঁর গল্পের আলোচনায় এ সত্য দেখাবার চেষ্টা করব। তার আগে শরৎচন্দ্রের আরও একটি উপন্যাসের অংশ বিশেষ ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের গহর শরৎচন্দ্রের সফল সৃষ্টি। গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। তার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গেয়ে ভিক্ষে করত। গহর মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটতে পারে, যেকোনো সময়ে, যেকোনো বিষয়ে — অনেকটা পাঁচালি ধরনের। কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো *রামায়ণ* রচনার স্বপ্ন ও সংকল্পে সে *রামায়ণ* রচনা করেছিল। যে *রামায়ণ* পাঠ শুনে বৃদ্ধ নয়নচাঁদ চক্রবর্তী বলতেন, 'তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্ — তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' এই অংশে শরৎচন্দ্র আমাদের পৌঁছে দেন লোকায়ত, সমন্বয়-আশ্রিত বাংলার গ্রামের সত্যিকারের চিত্রে। যে চিত্র আমরা বিভূতিভূষণের গল্পপাঠে বারবার আরও বিস্তারিতভাবে পাই।

দুই

বাংলার গ্রামগুলোতে শিব-কে ঘিরে একধরনের সমন্বিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। যা আজও আধমজা নদীর মতন বহমান। শিবকে ঘিরে লোকায়ত জীবনে বহু সংগীত রচনা হয় — কোথাও গাজন গানে, কোথাও গম্ভীরা গানে। শিব কোথাও ভোলা-মহেশ্বর, কোথাও ভাঙড়-ভোলা, কোথাওবা নানা। কিন্তু এই গান সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ গাইত এবং সবাই নির্বিশেষে শুনত। এ ছবি বিভূতিভূষণের গল্পে পাই। 'অন্তর্জলি' গল্পে ডুমুরদহের গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলির জন্য আনা হলে, লোকমুখে চারিদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিধার থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। যারা আসে, তারা চক্রবর্তী মশায়কে দেখে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যায়। কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, ভিড় জমে যাওয়ার ভয়ে। এই অগণন মানুষের ভিড়ে কাসেমালি ও আসে এবং বলে :

> এই মাত্র খবর শুনলাম। সবগুলো কাছারিতে আজ গাঁতি-জমার বিলির দিন। ঘোড়া ক'রে ফিরতে বেলা দু'প্রহর হয়ে গেল। নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি, শুনলাম চক্কত্তি মশায়কে ডুমুরদ'র ঘাটে অন্তর্জলি করতে নিয়ে গিয়েচে কাল রাত্তিরে। বলবো কি, শুনে মনটার মধ্যে কেমন ক'রে উঠলো। আর থাকতে পারলাম না। চক্কত্তি মশায় গেলে

এদিগরের ইন্দ্রপাত হয়ে যাবে যে! অমন গান কে বাঁধবে, অমন শিবের কুচুনি-পাড়া যাওয়ার পাঁচালী কে গাইবে? অমন অনুপ্রাসের ঘটা আর শুনবো না। আহা-হা! এখনো মনে আছে, গেয়েছিলেন ষষ্ঠিতলার বারোয়ারীর আসরে —

পঞ্চভূত মন্ত্রপূত ভূত বিশ্বময়।
ভূতে ভূতে ভূতোনন্দী, ভূত বিশ্বময়।

এর প্রায় কাছাকাছি ছবি পাওয়া যায় 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে। বারিক একজন গরিব মুসলমান চাষি। আধ-বুড়ো, মহা ফুর্তিবাজ মানুষটির একটাই স্বপ্ন, বেঁচে থাকার অবলম্বন — একটি অপেরা পার্টি গড়ে তোলা। এই অপেরা পার্টি গড়ে তুলতে গিয়ে সে অনেক সময় অন্যায় করে, অন্যায়ের কারণে অপমান সহ্য করেও তার স্বপ্নে অবিচল থাকে। লেখকের সঙ্গে বারিকের ভাগ-চাষি ও জমি-মালিকের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধের সূত্রে সে বহুবার টাকা নিয়ে এসেছে কিন্তু খরচ করেছে অন্য কাজে।

তারপর শুনলাম মুসুরি বুনবার টাকা দিয়ে বারিক ওর গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচে। একদিন বললাম — মুসুরি বুন্‌লে বারিক?

— আজ্ঞে বাবু।

— ক' বিঘে?

— এক বিঘে।

— আর দু'বিঘে?

— বাবু, আর দু'টো টাকা দিতি হবে। খরচ কুলোচ্চে না।

— মিথ্যে কথা। তুমি তোমার গানের দলের ডুগি-তবলা কিনেচ সেই পয়সা দিয়ে। কোথায় তোমার গানের দল?

— ওই জেলেপাড়ার জেলে ছোঁড়াদের নিয়ে বসি। রোজ আখড়াই হয়। গান-বাজনা ভালবাসি বাবু। এবার পূজোর সময় 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' নামাবো বারোয়ারী আসরে — দেখি যদি খোদার মর্জি হয় — আমার ছোট ছেলে কেষ্ট সাজে, দ্যাখবেন কি গানের গলা — কি এ্যাক্‌টটা —

বারিক মুসুরি বোনবার টাকা নিয়ে চলে যায়। আর দেখা করে না। এমনকী ধানের সময় ভাগের ধানও দেয় না। খুব রেগে বারিকের বাড়ি গিয়ে, বারিকের অবস্থা দেখে লেখকের আর রাগ থাকে না।

কি মুশকিল, এই রকম বাড়ীঘর ওর! মাত্র একখানা চারচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানালার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো, দোর পর্যন্ত নেই ঘরের। ওর দলিজে বিছানো আছে একখানা বেদে-চট অর্থাৎ খেজুরপাতার বোনা পাটি, একটা কলঙ্কধরা তামার বদ্‌না, একটা হুঁকো আর তামাক, টিকে রাখবার মাটির পাত্র। একখানা অত্যন্ত ছেঁড়া ও ময়লা রাঙা নরুনপাড় শাড়ী চালে শুকুচ্চে। চালের অন্যস্থানে একটা কুমড়ো গাছ উঠেছে। উঠোনে

একখানা ভাঙা গরুর গাড়ী। সবসুদ্ধ মিলে অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা।

কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রাখতে গেলে ভাব-প্রবণ হলে চলে না। লেখক কড়া সুরে বলেন: 'মোটে দু'বিশ ধান পেলাম তিনবিঘে জমিতে? আমার সবসুদ্ধ বাইশ-তেইশ টাকা নিয়ে এসেছ, তার বদলে ধান দাও। আর বছরের ভিটের খাজনা দু'টাকা তাও শোধ করো। নইলে কালই নালিশ ঠুকে দেবো।'

বারিকের দুটি ছেলে — বড়োটির বয়স আঠারো-উনিশ, ছোটোটির চোদ্দো-পনেরো। তারা লেখককে খুরসি পিঁড়ি এনে বসতে দেয়। বারিক লেখককে ঠান্ডা করতে তামাক খেতে দেয়। বড়ো ছেলেটি গোরু চরায় এবং দুটি ছেলেই ভালো গান গায়। বারিক ছেলেদের গান শোনাবার প্রস্তাব দেয় লেখককে। তারপর দুটি ছেলে ধরাধরি করে দু-বস্তা ধান বার করে গোরু দুটো খুঁজে নিয়ে এসে গাড়িতে জুতে দেওয়ার উদ্যোগ করতে — লেখক আরও ধান দাবি করে।

— বাবু, আল্লার কিরে, ঘরে আর ধান নেই। সব দেলাম আপনাদেরে। আর কিছু নেই, আপনি দেখে আসুন ঘরে।

— তোমার ধান রইলো না?

— না বাবু, সব দেলাম।

— তুমি ছেলে-পিলে নিয়ে খাবে কি?

— তা' আর কি করবো বাবু। আমি নালিশে বড্ড ভয় করি।

লেখক বারিকের অনুরোধে জেলেপাড়ায় ওদের দলের ঘরে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলেন। 'বাঁওড়ের ধারে একটা জামগাছের ছায়ায় লম্বা দোচালা ঘর, কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল, বসবার জন্যে খানচারেক পুরনো মাদুর, এককোণে দু'জোড়া ডুগি-তবলা, একখানা খোল, একজোড়া মন্দিরা, গোটা দুই থেলো হুঁকো টাঙ্গানো বাঁশের খুঁটির গায়ে। ... বাঁওড়ের স্বচ্ছ জলে পদ্মফুল ফুটে আছে। লম্বা লম্বা জলজ ঘাসের মধ্য দিয়ে সুঁড়ি বালি মাটির পথ গিয়ে জলের ঘাটে নেমেচে, পানকৌড়ি বসে আছে পাট-শ্যাওলার দামে। ওপারে কাজি সাহেবের দরগা, ভাঙ্গা পাঁচিলে মস্ত বড় জিউলি গাছ বেড়ে উঠে সমস্ত দরগা ঘরের ওপর ঝুপসি ছায়া পড়ে আছে, আঠা ঝরে পড়চে গাছটার কাঁধ থেকে — খানিকটা সাদা, খানিকটা লাল — আঠা ঝরে ঝরে দরগা ঘরের পশ্চিম দিকের পাঁচিলের কোণটা একেবারে ঢেকে গিয়েচে। দরগার ঘাটে ওপারের আমিনপুর গ্রামের কৃষক-বধূরা কলসী কাঁখে জল নিতে যাওয়া-আসা করচে।'

লেখককে বারিক অপেরা পার্টির লোকজন সহজ আন্তরিকতায় অভ্যর্থনা জানাল। তামাক সেজে কলকে হাতে দিয়ে — সেবা করতে অনুরোধ জানাল। একটু পরে বারিক এসে বলে, গান শুনিয়ে দে বাবুরি ...। বারিক বেহালা বাজায়, বারিকের নধর কালো ছোটো ছেলে (যে কৃষ্ণ সাজে) শোনাই যাত্রার এক গান আরম্ভ করলে —

'ওরে ও কিছান ভাই,
আমি হেথা বলে যাই।

গওরেতে শোন সেই বাণী —'

'বারিক ধমক দিয়ে বল্লে — মানভঞ্জন পালার সেই গানখানা গা — আমার সঙ্গে ধর্। বলে নিজেই রগে হাত দিয়ে আরম্ভ করলে —

ধনি, কি সুখে রাখিব পরাণ
কানু হেন গুণনিধি গ্রেহে না আইল যদি
অঝোরে বহিল দু'লয়ান —
(ও) লয়ান যে বহে যায়
গুণমণির বিরহ-জ্বালায়
লয়ান যে বহে যায় —'

বারিক অপেরা পার্টির মহল্লা দেখে জ্যোৎস্নারাতে 'চন্দ্রাবলীর গান' গান শোনার অনুরোধ উপেক্ষা করে লেখক চলে আসেন। দেখেন অনেক রাতে বারিক বাড়ি ফিরছে বন-জঙ্গলের পথ দিয়ে। বারিকের বাড়ি চালদী গ্রাম, অপেরা পার্টির মহড়া ঘর থেকে প্রায় দেড় মাইলের পথ। অধিকাংশ ঘন বন-জঙ্গলে ভরা, সাপখোপের ভয় তো আছেই। অথচ আলো নেই। আলোর পয়সা নেই তার। লেখকের প্রশ্নের উত্তরে বারিক বলে — 'আর বাবু আলো! কেরাচিন তেল কনে পাবো? কেরাচিন তেল অভাবে অন্ধকারে ভাত খেতে হচ্চে রোজ রোজ।'

বারিক আরও গরিব হয়ে পড়ে। দেনার দায়ে তার বলদ ক্রোক হয়ে যায়। 'ধান কর্জ' না পেয়ে একবেলা অনাহারে থাকতে হয় তাকে। তার প্রতিবেশীর বর্ণনায় — 'বস্তর আবানে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই।' লেখক অবাক হন। যেদিন তিনি বারিক অপেরা পার্টির ঘরে গিয়ে বারিক ও তার ছেলের গানবাজনা শুনেছেন ঠিক সেই দিনেই তার গোরু ক্রোক হয়েছে। বারিকের গাড়িও বিক্রি হয়ে যায়।

বারিক ক্রমে আরও সম্বলহীন হয়ে পড়ে। তার অপমানের শেষ থাকে না। খাওয়ার চাল কেনার জন্য দু-কাঠা মুসুরি আর দুটো মানকচু বেচতে এলে আহম্মদ দফাদার ফসল দেওয়ার পায়নার টাকা বা ফসল কিছুই না ফেরত দেওয়ার কারণে সবকিছু কেড়ে নিয়ে গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করতে থাকে। এই অপমানের দিনেই রাত প্রায় দশটার সময় শোনা যায় বারিক উচ্চৈঃস্বরে রাগিনী ভাঁজতে ভাঁজতে বারিক অপেরা পার্টির মহড়া দিয়ে ফিরছে।

এসময়ে অকস্মাৎ বারিকের বড়ো ছেলে মারা গেল। এতই গরিব হয়ে পড়েছে বারিক যে ছেলের কাফনের কাপড় পর্যন্ত কিনতে পারল না সে। সবাই ভাবল এবার বুঝি বারিক খুব ভেঙে পড়বে। কারণ এই ছেলেটি 'মাথাধরা' হয়েছিল তার। অথচ সেইদিনই রাত দশটা-এগারোটা। গোসাই বাড়ির জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে লেখক বাঁশি, বেহালা, ডুগি-তবলা ও মানুষের গলার একটা সম্মিলিত রব শুনে নাটমন্দিরে গিয়ে দেখেন —

বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্চে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পটি পড়তে গিয়ে মনে হয় লেখক এই গল্পের মধ্য দিয়ে তিনটি সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এক. বারিক মুসলমান অথচ শ্রীকৃষ্ণ ও তার প্রেম বিষয়ক শিল্প সাধনায় আত্ম-নিবেদিত। এই আত্ম-নিবেদিত বারিক আমাদের এমন এক সমাজ-ইতিহাসের সন্ধান দেয় যেখানে অগণন মানুষ জাত-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে জীবনযাপন করত এবং যে সময়টা আমাদের দেশের ইংরেজ শাসন ও তার 'ভাগ কোরে শাসন করো' নীতি, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বণিকী অবক্ষয় ও নগরায়ণের ব্যাপকতায় হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যেতে বসেছে। দুই. চিৎপুরের হাতে বাংলার যাত্রাপালা চলে যাওয়ার আগে আমাদের গ্রামবাংলার হেটো ছাড়াকার বা বাউল গায়কদের মতন এক ধরনের যাত্রাপাগল শিল্পী দেখা যেত যারা শিল্পসাধনায় নিবেদিত-প্রাণ। এখনকার টিভি কালচার যেভাবে গ্রামকে গ্রাস করছে তাতে এই এক-আধজন বারিক যাঁরা গ্রামে এখনও বেঁচে আছে ছোটো কোনো যাত্রা বা নাটক, গাজন, গম্ভীরা বা আলকাপ গানের দল নিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিনতর হয়ে পড়ছে। তিন. আমরা যারা এই সময়ে নগরে, নগর উপকণ্ঠে, মফস্সলে গ্রুপ থিয়েটার বা ক্ষুদ্রপত্রিকা চালাই — তারা এক-একজন বারিক। আমরা বোধহয় বারিকদের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা অন্য ফর্মে বহন করে চলেছি। আমরা কেউ আকাশ থেকে পড়িনি — আমরা এই দেশেরই ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার ফসল। না হলে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বা গ্রুপ থিয়েটার নেই কেন?

তিন

বাইরে থেকে এসে হিন্দু-জনজীবন ও পরিবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে পরমাত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা নিয়ে বিভূতিভূষণ দুটি গল্প লিখেছেন — 'রূপো বাঙাল' ও 'কাঠ বিক্রি বুড়ো'। 'আমি গাছ বিক্রি পছন্দ করি না। কোন গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্যে — ওদেরই ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।' লেখকের এই কথা দিয়ে 'কাঠ বিক্রি বুড়ো' গল্পের শুরু।

> একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে।
>
> বললাম — কি চাই?
>
> — বাবুর গাছ বিক্রি আছে, বিক্রি করবেন?
>
> — কি গাছ?
>
> — বাবুর বাড়ীর পেছনে বিলিতি চট্‌কা আছে, বাগানে শিশু আছে, কলুচটকা আছে।
>
> লোকটার কথায় দক্ষিণের টান। বললাম — বাড়ী দক্ষিণে?

লোকটা জানায় তাদের নৌকো ঘাটে বাঁধা আছে। তারা বাগান কিনে গাছ কেটে কাঠ বোঝাই করে কলকাতায় পাঠাবে। তারা আরও জানাল যুদ্ধের আগে যে গাছের দাম ছ-টাকা ছিল, তার দাম এখন চোদ্দো টাকা।

গাছগুলো কেটে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করছে বলে লেখক কাঠ বিক্রি বুড়োর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। কিন্তু একসময় লেখকের মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিধে; কুটিল, ধূর্ত ব্যাবসাদার নয়।

একদিন কাঠ বিক্রি বুড়ো লেখকের কাছে তার গ্রামের অভাব-অনটনের কথা বলে। লেখক আত্মীয়তা বোধ করেন। কাঠ বিক্রি বুড়ো বলে — 'কনটোলের কাপড় একখানা দিতি পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।'

এই সময়ে গ্রামের এক তরুণ লেখক-প্রতিবেশী চব্বিশ দিন টাইফয়েডে ভুগে মারা যায়। তরুণটির একটি ফলের দোকান ছিল, ছিল স্ত্রী ও পাঁচটি ছোটো ছেলেমেয়ে।

একদিন লেখক ওই সদ্যপ্রয়াত তরুণটির বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক অসম্ভব সুন্দর ও অবাক করা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান। দেখেন, সেই মুসলমান কাঠ বিক্রি বুড়ো তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তরুণীটি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কাজ করছেন আর ছেঁচতলায় বসে বুড়ো বলছেন : 'সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হোল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকি চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হলি, ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোকির জল আর ফ্যালবেন না — আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায় —'

লেখক এতক্ষণে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। দেখেন, বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলছেন।

'রূপো কাকা আমাদের আত্মীয় নয়, বাবার বন্ধু নয়, বাড়ীর গোমস্তা কি নায়েব নয়, এমন কি রূপো কাকা হিন্দু পর্যন্ত নয়। রূপো কাকা আমাদের কৃষাণ মাত্র। মাসে সাড়ে তিন টাকা মাইনে পায়।

রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও ও। পিসিমার মুখে শুনেচি রূপো কাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। কেন এসেছিল দেশ থেকে তা শুনিনি। সেই থেকে আমাদের গ্রামেই রয়ে গিয়েচে — বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল' — এ উপাধিরই বা কারণ কি তা বলতে পারব না।'

এই রূপো বাঙাল তার অসম্ভব বিশ্বস্ততা ও স্মৃতিশক্তির কারণে লেখকের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। লেখকের বাবা কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেন। বাড়ির সমস্ত হিসেব রাখত রূপো বাঙাল। এবং সমস্তটাই স্মৃতিতে থাকত তার।

বাবা বাড়ী এসে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসতেন মহাজনী খাতা খুলে।

বলতেন — কে কি নিয়েচে রূপো?

রূপো কাকা বলতেন — লিখে রাখো, সনাতন ঘোষ ছ কাঠা কলাই, দু কাঠা বীজ মুগ, কড়ি ছ কাঠা —

— আচ্ছা।

— হয়েচে? আচ্ছা লেখো — বীরু মণ্ডল দু বিশ ধান, কড়ি পাঁচ সলি —

— আচ্ছা।

— হয়েচে?

— হয়েচে।

রূপো বাঙাল একবিশ ধান দু কাঠা কলাই —

আচ্ছা।

এভাবে অনর্গল স্মৃতি থেকে বলে যেতে পারত রূপো বাঙাল। সারারাত জেগে গ্রামে চৌকিদারি করে, সব গ্রাম ঘুরে এসে চৌকিদারি পোশাকে লেখকদের 'চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায়' বসে থাকত। অনেকসময় রাত্রে বাড়ি এসে লেখকের ঠাকুরমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলত — 'ওঠো বৌমা, জাগন থাকো। রাত খারাপ।'

মৃত্যু শয্যায় রূপো বাঙাল শেষ কথা বলেছিল লেখকের বাবাকে :

— কে ডা? সতীনাথ? কবে এলে?

— এই পরশু এসেচি।

— বেশ করেচ। এই শোন, খাতার মুড়োয় লিখে রাখো, মুই চিঁড়ে খাবার বেনামুরি ধান নিইচি চার কাঠা, আহাদ মণ্ডল কলাই দু কাঠা, বাড়ী ছ কাঠা, বিষ্টু ধেরিসি ছ কাঠা ধান, বাড়ী চার কাঠা — মোর ধান পোষ মাসের ইদিকে দিতি পারবো না বলে দিচ্চি — ভুলে যাবো, লিখে রাখো —

লেখক গল্পের শেষের দুটি লাইন লিখেছেন : 'আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা এসব। এইসব চোরাবাজারের দিনে, জুয়ো চুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।'

'রূপো বাঙাল' ও 'কাঠ বিক্রি বুড়ো' গল্পদুটিতে উল্লেখিত প্রধান চরিত্র-দুটি মুসলমান। লেখক এঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে তুলে এনে সম্পর্ক গড়ে তুলে দেখাতে চেয়েছেন বাংলার গ্রামজীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের — সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের শিকড় কত গভীরে। কাঠ বিক্রি বুড়ো যুদ্ধের বাজারে কাঠ ব্যাবসার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে কলকাতার অভিমুখে পাড়ি জমিয়েছে। সে এতই নিরীহ, সরল ও নির্বোধ যে গাছ কাটলে কী ক্ষতি হয় তা সে বোঝে না, জানেও না। অথচ মানুষটি জলের মতো, বাতাসের মতো সহজ-সরল-মায়াময়-সুন্দর। রূপো বাঙাল বিশ্বস্ততায় ও দায়িত্বশীলতায় তার মালিককেও অতিক্রম করে যায়। লেখক এখানে দেখান : বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও নাগরিকতা মানুষের মনোরাজ্যে এমন জটিলতা তৈরি করছে যে রূপো বাঙাল বা কাঠ বিক্রি বুড়ো-র মতো মানুষ আর পাওয়া যাচ্ছে না, পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এসব মানুষেরা।

এভাবেই তাঁর গল্পে জীবনদর্শনের পাশাপাশি অস্থির সময়ের রাজনৈতিক মূল্যায়ন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইচু বললে — আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে — জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

— কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

— এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

— তবু আর কি? পানি দে — নমাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নামাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের আবাল্যের অতি প্রিয় কাজ। জন খাটতে যেতে পারুক নাই পারুক নামাজ না পড়ে সে দিনের কাজ শুরু করে না।

'নিমি বললে — উঠেছ যখন তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ-আনা করে জন, অন্যসময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভাল না।'

এমনই সহজ সরল আধ্যাত্মিক জীবনযাপন 'ফকির' গল্পের ইচু মণ্ডলের। গল্পটি কেবল ইচু মণ্ডলের ইচু ফকির হয়ে যাওয়ার গল্প নয়। গল্পটির মধ্যে আরও অনেক মাত্রা। ইচুর বড়ো ভালো লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে যায় তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকে মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে।

একবার ইচু তার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান ভুল করে কেটে ফেলেছিল। বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশেই তার জমি। শুনে দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধান ফেরত দিতে গেল মুখুজ্যেদের। মুখুজ্যেরা সে ধান কিছুতেই নেবে না — ইচুকে দিয়ে দেবে। ইচু হাতজোড় করে বললে, 'তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরাণ বেঁচিয়ে রাখব — যা না দেবেন সে আমার হারাম।'

ইচুর সংখ্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান। ইচুকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে — 'চাচা, তোমার বয়স হলো ক কুড়ি?' ইচু তার উত্তরে বলে, 'তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতি পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হলো পেরায় —'

এ উত্তর শুনলে মনে হয় ইচু কোনো বাস্তব চরিত্র নয় রূপকথার চরিত্র।

এহেন সরল মানুষটির জীবনে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের অভিঘাত আসে তার বউ 'নিমি'র খুন হওয়া নিয়ে। 'কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ির উঠোনে।' ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছল। ফজরের

নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ঘরের পেছনে গিয়ে নামাজ সেরে সবার সামনে এলে সবাই তাকে নিয়ে রেল লাইনের দিকে যায়। ইচু দেখল রেললাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ — 'গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মৃতদেহ নিমির।' ইচুকে গ্রামের লোক মিলে কত কিছু প্রশ্ন করে — সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বলে — মুই কিচু বলতি পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

— বউরি কিছু বললে? ঝগড়া হয়েল?

— কিছু না চাচা।

— বউ ঘরে শুয়েল?

গ্রামের লোকজনের স্থির বিশ্বাস ইচু খুন করেনি। তারা পুলিশের ঝামেলা এড়াতে ইচুকে নিয়ে বনগ্রামের বড়ো মোক্তার রামলাল চাটুজ্যের কাছে যাওয়ার পরামর্শ করে। রামলালবাবু সকালে সেরেস্তায় বসে চা খাচ্ছিলেন। এদের দেখে সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন। রামলালবাবু নানা প্রশ্নের পর জিজ্ঞেস করলেন — 'বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?' প্রশ্ন শুনে গ্রামের মোড়ল প্রবীণ মানুষ হাফেজ চুপচাপ হয়ে যায়, মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না তার। বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকরা দিয়ে বলে — 'বাবু, ভাল না।'

ইচু অবাক হয়। নিমির স্বভাবচরিত্র ভালো ছিল না? সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

এরপর রামলাল গ্রামের লোকদের কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানতে চায়।

'এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাতজোড় করে বললে — বাবু, মোর একটি কথা বলার আছে।'

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা — মোক্তারবাবু ভাবলেন। হাফেজ বছিরদ্দি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে — বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন — মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে আবদার রাখবেন মোর — আল্লা, দীন-দুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

— আহা-হা, পা ছুঁয়ো না — কি — কি বল —

— বাবু, ঝেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ-ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি — আর কিছু আমার বলার নেই বাবু।

রামলালের সেরেস্তায় বজ্রপাত ঘটলেও লোকে অতটা চকিত হত না। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এখানে লেখক একজন স্বশিক্ষিত গ্রাম্য সরল ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষকে নিয়ে উপস্থিত করেন তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিমান জটিল নাগরিক মানুষের সামনে। গ্রামীণ সরলতা উৎসারিত আলো নাগরিক ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়। ইংরেজের তৈরি শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ ও লোকায়ত শিক্ষায় আপাত অশিক্ষিত মানুষের মুখোমুখি উপস্থিতিতে লেখক দেখাতে চান ইংরেজের শিক্ষা মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটায় না, মানুষের মধ্যে একধরনের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার আভিজাত্য গড়ে তোলে।

রামলালবাবু বার লাইব্রেরিতে বসে সেই কথা স্বীকার করেন।

> সত্য অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশ, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে — সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক — আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

এরপর শাইলিপাড়া গ্রামে পুলিশ, দারোগা আসে কিন্তু ইচুকে অ্যারেস্ট করে না। সব জেনে বুঝে তারা ইচুকে ছেড়ে দেয়। সেই সন্ধ্যায় ইচু নামাজ সেরে ঘরে ঢুকতেই নিমির কথা মনে পড়ে। মনে মনে ইচু নিমিকে ক্ষমা করে। সে নিমিকে ভালোবাসত — ওসব সে বিশ্বাস করে না।

পরদিন ইচুকে গ্রামের মানুষ আর দেখতে পায় না। সে গৃহস্থালির সমস্ত কিছু ফেলে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন।

> খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুর-চটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নামাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

পাঁচ

'হারুণ অল রসিদের বিপদ' গল্পের হারুণ ও আবুল কাসেম নামে দুটি শান্ত চেহারার পাড়াগেঁয়ে শহর না দেখা সরল ছেলে তাদের গ্রাম জানিপুর থেকে দু-মাইল দূরের স্কুলে পড়তে যায়। ওদের গ্রামে স্কুল নেই, বাড়ির অবস্থা ভালো, সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নেই, 'তবুও বাপমায়ের হয়েছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। ... ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।'

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড় মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল,

সোঁদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গরুতে। ওরা পরামানিকদের বাগানের আম কুড়োতে কুড়োতে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড়ই মজা হোতো।

প্রকৃতিমুগ্ধ বালকদ্বয় মাস্টারদের খুশি করার অদ্ভুত পথ আবিষ্কার করে। ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে খুশি করার জন্য মাদলার বিল থেকে পদ্মফুল তুলে এনে ক্লাসের টেবিল সাজায়। ইতিহাসের ক্লাসে বিপিন মাস্টারের বেতের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাঁর বাড়িতে এঁচোড় বয়ে দিয়ে আসে।

এভাবে চলতে থাকলেও শেষ রক্ষা হয় না। একদিন সাহেবি পোশাক পরা ইন্সপেক্টর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে স্কুল পরিদর্শনে আসে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন — এটি কোন ক্লাস? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা?

বিপিনবাবু বললেন — ইতিহাসের।

— বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বললেন — কি নাম?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে — হারুণ-অল-রসিদ।

— অ্যাঁ?

— স্যার, হারুণ-অল-রসিদ।

— বোগদাদ থেকে কবে এলে?

— আজ্ঞে, স্যার?

— বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাসলেন।

— সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ?

— আজ্ঞে স্যার।

— কুতুবুদ্দিন কে ছিলেন?

হারুণ বললে — রাজা।

— কোথাকার রাজা? কোথায় থাকতেন?

— বিলেতে।

এভাবে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলতে থাকে। পরে হেডমাস্টার ক্লাসে এসে হারুণকে বলেন, পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুণ-অল-রসিদের নামে তোমার নাম। তিনি ছিলেন গরিবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন।

এই গল্পের মধ্য থেকে তিনটি সত্য প্রকাশ পায়। এক. ইংরেজ রাজত্বের শেষ পর্বেও বাঙালি মুসলমান চাষি পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার হার কত নগন্য ছিল, তা এই গল্পে পাওয়া যায়। দুই

বাঙালি মুসলমানরা আরবি ভাষা-সংস্কৃতি থেকে নাম সংগ্রহ করে ছেলেমেয়েদের নাম রাখে। বাঙালি মুসলমানদের যে আরবি নাম দেখা যায় — অধিকাংশ তার অর্থ বা তাৎপর্য না জেনে নাম রাখে। এক্ষেত্রে নামকরণ যে কত সমস্যা তৈরি করে তার উদাহরণ গল্পটি। তিন. দীর্ঘসময় ইংরেজ শাসনের ফলে গ্রামজীবনে রাজা, বাদশা, শাসক ইত্যাদি শব্দের সমার্থক ইংরেজ হয়ে দাঁড়ায় এবং রাজা-বাদশার দেশ হয়ে যায় বিলেত। এখানে বিভূতিভূষণ তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ভাষ্যও তুলে ধরেন গল্পে ।

ছয়

নিম্নবর্গের মুসলমান জীবনের পক্ষে উচ্চবর্গের মানুষের কাছে সম্প্রীতির আহ্বানের গল্প 'আহ্বান'। লেখক অনেকদিন পরে নিজ গ্রামে ফিরেছেন। পৈত্রিক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটেতে জঙ্গল গজিয়েছে। বাবার পুরাতন বন্ধু চক্কত্তি মশাই বলেন — 'আমি খড়-বাঁশ দিচ্চি, চালাঘর তুলে ফেলো, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো। আহা নরেশের ছেলে, দেখেও সুখ। ক'দিনই বা আছি। বাস করো গাঁয়ে।'

গ্রামের মানুষের খোঁজখবর খবর নিতে গিয়ে লেখক দেখেন — যাদের বাল্যকালে ছোটো দেখে গেছেন তাদের অচেনা লাগে, যাদের যুবক দেখে গিয়েছিলেন তারা বৃদ্ধ হয়েছে। আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যেতে গিয়ে জমির করাতির বৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখেন। 'আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্র-বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত। কোনো তফাৎ নেই, ডানহাতে নড়ি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বোধহয় বা বাজারের দিকেই চলেছেন। বগলে একটা ছোট থলে।'

পরিচয়ের পর লেখকের বাড়ি বৃদ্ধা যাওয়া আসা করে, খোঁজখবর নেয় এবং মা-পিসিমাদের মতো ঘনিষ্ঠ আদরে লেখককে — 'অ মোর গোপাল' — বলে সম্বোধন করে। কখনো আম, কখনো কারো কাছে চেয়ে আনা দুধ, কামিনী সরু ধানের ভালো চিঁড়ে নিয়ে এসে লেখককে বিব্রত করে। বৃদ্ধা জানে না বা বোঝে না মুসলমানদের চিঁড়ে বা দুধ ব্রাহ্মণ পাড়ার মানুষ ব্যবহার করে না।

> একা রামে রক্ষা নেই, বুড়ির কথা শেষ হোতে না হোতে দেখি একটা আধফর্সা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক অদুরে আমতলায়, এদিকেই আসচে। আরও বিপদে পড়লাম এইজন্যে যে, ঠিক সেই সময়ে আমার জ্ঞাতি খুড়োমশায়কেও এদিকে আসতে দেখা গেল! সর্বনাশ! তাঁর বাড়িতে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, আর তিনি যদি জানতে পারেন যে এদের হাতে তৈরি চিঁড়ে বা খাবার জিনিস আমি খাই — তাহলেই তো এ পাড়াগাঁয়ে হয়েচে! চিঁড়ে যে ওরা আজই প্রথম এনেচে একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? আজ দুধ, কাল চিঁড়ে —
> রুক্ষ সুরেই বল্লাম — এখন যাও না — দেখচো না ব্যস্ত আছি?
> — চিঁড়ে ক'টা নেবার একটা কিছু দ্যাও বাবা।
> — ও সব এখন নিয়ে যাও — হ্যাঁ, হ্যাঁ — পরে হবে। এখন যাও —
> বুড়ি একটু অবাক হয়ে বল্লে — তা চিঁড়ে ক'টা —
> খুড়োমশায় প্রায় এসে পড়েচেন দাওয়ার ধারে।

হাত নেড়ে নেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে বুড়ির দিকে চেয়ে বলি — আঃ নিয়ে যাও না — ভাল জ্বালা!

খুড়োমশায় বল্লেন — কি ওতে? কি বলচে জমিরের স্ত্রী?

— কিচ্ছু না। ইয়ে বিক্রি করতে এসেচে — যাও এখন —

ভগবান জানেন, বুড়ি আমার কাছে চিঁড়ের বদলে পয়সা নিতে আসেনি।

লেখককে বৃদ্ধা তাঁর পর্ণকুঠিরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে — 'তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুরপাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি। বাউনের ছেলে, মোদের এঁটোকাঁটা মাদুরে কি বসবে? তাই বলি একটা নতুন চেটাই বুনে রাখি, যখন আসবে এখানেতেই বসবে।'

এরপর লেখক পুনরায় ছুটিতে গ্রামে এলে এক মধ্যবয়সি মুসলমান স্ত্রীলোক লেখককে জানায় — 'ওই সেই বুড়ি — এখানে যিনি আসতো। তেনার বড্ড অসুখ — এবার বোধহয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে — অস্থির, আমারে রোজ শুধোয়। আমি বলি, তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, সবসময় কি আসতে পারেন? কি মায়া আপনার ওপর, আর-জন্মে বোধহয় পেটে ধরেল। এ-জন্মে তাই এত টান — একবার দেখে আসুন গিয়ে। বড্ড খুশি হবে তাহলি —'

বিকেলে বেড়াতে যাওয়ার পথে লেখক বৃদ্ধাকে দেখতে যান। দেখেন সেকেলে উঁচু দাওয়ার পাঁচচালা, বড়ো হাতি ঘর — স্বামীর আমলের সম্পন্নতার ছাপ বহন করছে। কিন্তু ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়ছে চাল থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলছে, মাটির দাওয়া নানা স্থানে ভেঙে পড়ছে, বাঁশের খুঁটি নড়বড় করছে।

লেখককে দেখে বৃদ্ধা ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে — 'ভাল আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে! বসতে দে গোপালকে — বসতে দে —'

পরে পরম আত্মীয়ের মতো অনুযোগের সুরে বলতে থাকে — 'তোর জন্যি খাজুরের চাটাইখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরোনো হয়ে ভেঙে যাচ্চে। তুমি একদিনও এলে না গোপাল — অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আসো না —'

ইতোমধ্যে পাড়ার লোক জড়ো হয়। বলতে থাকে — 'বুড়ি কেবল আপনার কথা বলে বাবু। আপনাকে দেখবার বড্ড ইচ্চে। বুড়ি বোধহয় এবার বাঁচবে না।'

বুড়ির দু-চোখে জলের ধারা। লেখককে বলে — 'গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস —'

বছরখানেক পরে লেখক গ্রামে আসতে পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে দেখা হতে সে জানায় 'ও মা, আজিই তুমি এলে বাবাঠাকুর? সে বুড়ি যে কালরাতে মারা গিয়েচে। তোমার নাম করলে বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল —'

কাফনের 'কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল — মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন এখন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন —'

একটি গরুর গাড়ির পুরনো কাঠামোর ওপর বৃদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেচে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়চে। কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে — দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমি দ্যাও — তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে —

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো — অ মোর গোপাল।

সাত

অন্যান্য গল্পে মুসলমান জীবন ও চরিত্র-অনুষঙ্গ থাকলেও মুখ্যত আলোচিত সাতটি গল্পে মুসলমান জন-জীবন, লোকায়ত অনুষঙ্গের ছবি ও একইসঙ্গে বিভূতিভূষণের রাজনৈতিক বীক্ষাকে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গল্প পড়তে গিয়ে বিভিন্ন ডায়লেক্ট ও ভাষা-মুদ্রার ব্যবহারে মনে হয় বিভূতিভূষণ ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্পগুলো লিখেছেন। 'অন্তর্জলি' গল্পে কাসেমালি বলছে 'নামাজ সেরে ভাতপানি গালে দিয়ে সবে শুইচি।' 'ফকির' গল্পে ইচু বলছে — 'ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ-ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি —।' প্রথম গল্পের 'ভাতপানি' শব্দটি মুসলমান জনজীবনের মানুষ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আবার, সম্পন্ন, শিক্ষিত কাসেমালির 'নামাজ' শব্দটি স্বশিক্ষিত জন-মজুর ইচুর মুখে 'নমাজ' হয়ে যায়। ইচু বলে 'পাঁচ-ওক্ত'। এই শব্দটি কোনো শিক্ষিত মুসলমানের মুখে হয়ে যেত 'পাঁচ-ওয়াক্ত'। বিভূতিভূষণ কেবলই মুসলমান জনজীবনের শব্দ-সচেতন ছিলেন না, একই শব্দ একই জনজীবনের নানা অবস্থানে যে কীভাবে বদলে যায় সে সচেতনতাও তাঁর ছিল। এছাড়া এমন কিছু ডায়লেক্ট বিভূতিভূষণ ব্যবহার করেছেন যা কেবল লোকায়ত নয় একেবারে মুসলমান জনজীবনের অন্দরমহলের।

'ফকির' গল্পের ডায়লেক্ট :

'— ওমা আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।' বা 'রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরণ বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি — আবার কি ধার করতি ছোটব?'

'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে উল্লেখযোগ্য ডায়লেক্ট :

'— দ্যাও, ও দোকানী, বাবুরি (অর্থাৎ বাবুকে) নিমকি, সেঙ্গারা, সন্দেশ দ্যাও ... হ্যাদে বাবুরি লুচি দ্যাও আটখানা, ভাজা নেই?' বা 'বস্তর আবানে ওর ইস্তিরির ঘরের বার হওয়ার উপায় নেই।'

'আহ্বান' গল্পে পাই লোক-বিশ্বাস বা সংস্কারের ডায়লেক্ট :

যা আসলে হিন্দু জনজীবনের সংস্কার কিন্তু পাশাপাশি থাকার ফলে মুসলমান জনজীবনে প্রবাহিত। জমির করাতির বৃদ্ধা স্ত্রীর পরিচয় জানতে চাইলে লেখককে বলেছেন — 'আমার তো কেনার নাম করতি নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।' বৃদ্ধা অন্যত্র বলেছেন, 'কি নোকের পরিবার আমি। আজিই না হয় কপাল পুড়েচে।' 'নোকের পরিবার' এই ভাষাব্যবহার মুসলমান জনজীবনের নিজস্ব।

বিভূতিভূষণ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমান জনজীবনে ও তার চরিত্র-চিত্রণ করেছেন এ প্রমাণ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

> ঈদের ছুটিতে বিভূতিভূষণ বারাকপুর এলেন। নিজের বাড়ি ভগ্নাবস্থায়। আছেন সইমার মেয়ে 'পুঁটিদি'র বাড়িতে। নিজে রান্নাবান্না সব করে নেন। অবসর সময়ে 'আরণ্যক' লেখেন। গ্রামে থাকতে সেই বৃদ্ধা জমিরের স্ত্রী মারা গেল। তিনি কবরের সময় উপস্থিত রইলেন।
>
> (পৃষ্ঠা ১০৬)

বিভূতিভূষণ তাঁর *স্মৃতির রেখা* নামের দিনলিপিতে (২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রজৌন থানা) লিখেছেন :

> খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য অস্ত গেল। পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ! সন্ধ্যার সময় এসে রজৌন থানায় পৌঁছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। বেশ ভাল লোক — আজকাল এই হিন্দু-মুসলমান বিবাদের দিনে এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয় — মানুষের আত্মা সবসময়ে যেন বাইরের কুয়াশাতে দিশাহারা হয়ে থাকে না — বরং যখন আপনা-আপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে — এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

শরৎ-সাহিত্যে মুসলমান জনজীবন অবলোকনের দূরত্বের প্রসঙ্গ দিয়ে প্রবন্ধ আলোচনা শুরু হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর দেখার দূরত্বকে মরমি-মন দিয়ে অনেকাংশে ভরিয়ে তুলেছিলেন। বিভূতিভূষণের অবলোকন — রবীন্দ্রনাথ যাকে 'জীবনে জীবন যোগ' বলেছেন অনেকাংশে তাই। আর এই ধারার বিকশিত ধারাবাহিত রূপ দু-ভাবে পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায়। এক. অমুসলমান লেখক অথচ জীবনে জীবন মেলানো অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমান জনজীবন ও তার চরিত্র নিয়ে গল্প-উপন্যাস, কথাসাহিত্য রচনা করছেন। দুই. মুসলমান লেখক — জন্মসূত্রে এই জীবনের মানুষ হয়ে এই জনজীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করছেন। প্রথম ধারার লেখক কিন্নর রায়, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, সাত্যকি হালদার, দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সসীম কুমার বাড়ৈ, নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য প্রমুখ। দ্বিতীয় ধারার লেখক — এ বাংলায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আব্দুল জব্বার, আবুল বাশার, আফসার আমেদ, মুর্শিদ এ এম, আনসারউদ্দিন, নীহারুল ইসলাম, তারেক কাজী, আয়েশা খাতুন প্রমুখ। ওপার বাংলায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বাহিত এই ধারাটি আগামী সময়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠতম সাহিত্যধারা হিসেবে স্থান করে নেবে।